গীতা-ভাষ্যের ক্রমবিবর্তন এবং এর যথাযথ রূপ

ড: মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা প্রকৃতপক্ষে মহাভারতের ভীষ্মপর্বের একটি অংশ। মহাভারতের উক্ত পর্বের ২৩ থেকে ৪০ অধ্যায় পর্য্যন্ত গীতার পরিধি বিস্তৃত ভগবদ্ গীতাকে অনেক সময় স্মৃতি-শাস্ত্রও বলা হয়। এই শাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায় এবং শ্লোকের উপর সময়-ভেদে বিভিন্ন দর্শনের আলোকে বিভিন্ন মনীষী তাঁদের নিজ নিজ ভাষ্য / মতামত প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে শঙ্করাচার্য সহ অনেক বৈষ্ণব আচার্য তাঁদের নিজ নিজ ভাষ্য প্রকাশ করেছেন।

প্রাচীন বৈষ্ণব আচার্য্যগণের মধ্যে মধ্বাচার্য্য, নিম্বাকাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য প্রমুখ হলেন প্রধান। আধুনিক বৈষ্ণব আচার্য্যগণের মধ্যে শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর হলেন প্রধান। এইসব বৈষ্ণব আচার্য্যগণ গীতাকে মূলত ভক্তিমার্গের আলোকে ব্যাখ্যা করে এর ভিত্তি সুদৃঢ় করেন।

আবার কিছু ভারতীয় দার্শনিক গীতাকে নিজেদের সামাজিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন।

গীতার প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মধ্যে আচার্য্য শঙ্কর হলেন অদ্বৈতবাদী, রামানুজ বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী, মাধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী, নিম্বার্ক আচার্য্য দ্বৈত-অদ্বৈতবাদী, বল্লভাচার্য্য শুদ্ধ অদ্বৈতবাদী। এছাড়া মধুসূদন সরস্বতী এবং শ্রীধর স্বামীপাদও গীতার কিছুটা পৃথক ভাষ্য প্রদান করেছেন। পক্ষান্তরে শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-পাদ হলেন শ্রীমণ মহাপ্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী। তাঁদেরকে অনুসরণ করেছেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রমুখ।

মূলত গীতার প্রথম ভাষ্যকার হলেন শ্রী শঙ্করাচার্য্য (৭৮৮ - ৮২০ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর মতে গীতা মূলত নিরাকার ব্রহ্মের (impersonal absolute) কথাই তুলে ধরে। প্রায় দুই শতাব্দী পর শঙ্করাচার্য্যের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব আচার্য্য রামানুজ (১০১৭ - ১১৩৭ খ্রিস্টাব্দ) এগিয়ে আসেন। তিনি তাঁর লেখায় ভগবান কৃষ্ণের স্বরূপ তুলে ধরেন এবং পাশাপাশি শঙ্করের একদর্শী / এককেন্দ্রিক ব্যাখ্যা নাকচ করে দেন। এরপর আসেন মাধবাচার্য্য (১২৩৮-১৩১৭)। তিনি কৃষ্ণের ব্যক্তিসত্ত্বা আরোও

বিস্তৃত ভাবে তাঁর লেখায় তুলে ধরেন। রামানুজের মতো তিনিও শঙ্করাচার্য্যের এককেন্দ্রিক এবং সীমিত বক্তব্য বাতিল করে দেন। তিনি বলেন, ভক্তিমূলক সেবাই গীতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

১. গীতার অদ্বৈতবাদী ভাষ্য, বিশুদ্ধ অদ্বৈত-বাদের মূল সূত্র হলো - ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, জগৎ মিথ্যা। অর্থাৎ জগতের ব্যবহারিক গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও পারমার্থিক গ্রহণযোগ্যতা নেই। জীব এবং ব্রহ্ম হলেন অভিন্ন। কর্ম মুক্তি-লাভের উপায় নয়। কর্মের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি হতে পারে বলে কর্ম জ্ঞান লাভের সহায়ক বলা যায়। মুক্তিলাভের আসল উপায় হলো জ্ঞান। আর জ্ঞানের উদয় হলেই কর্ম সন্ন্যাস বা কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব।

শঙ্করাচার্য্যের মতে গীতার অন্যতম শিক্ষা হলো নিষ্কাম কর্ম। তবে এরূপ কর্ম জ্ঞানলাভের উপায় মাত্র। তাঁর মতে সগুণ ব্রহ্মের যে উপাসনা মানুষ করে তাও মায়া-কল্পিত। তিনি বলেন, জ্ঞানের উদয় হলে কর্ম সন্ন্যাস বা কর্মত্যাগ করা সম্ভব। জ্ঞান এবং কর্মের সমন্বয় গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। তাঁর মতে জগতে যে বৈচিত্র আমরা লক্ষ্য করি তা হলো একেরই বিচিত্র প্রকাশ। “সর্বং খল ইদং ব্রহ্ম” - এই হলো প্রকৃত উপলব্ধি। এভাবে তিঁনি গীতার বিশ্বরূপদর্শণ - অধ্যায়টির বক্তব্য পরোক্ষভাবে হলেও তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে যিনি শ্রদ্ধাবান, জ্ঞাননিষ্ঠ এবং জিতেন্দ্রিয় তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করতে পারেন।

আচার্য্য শঙ্কর গীতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভগবান উবাচ - শ্লোক (২য় শ্লোক) থেকে তাঁর ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন এবং সর্বত্র গীতার বিভিন্ন শ্লোকের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

আচার্য্য আনন্দগিরি তাঁর গীতাভাষ্যে মূলত শঙ্করাচার্যের মতকেই সমর্থন করেন। আবার শ্রীমধুসূদন সরস্বতী ছিলেন মূলত একজন অদ্বৈতবাদী। তবে তিনি মানুষের জীবনে কর্মনিষ্ঠা এবং জ্ঞাননিষ্ঠার সাথে ভক্তিনিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তাঁর মতে ভক্তিই কর্ম ও জ্ঞাননিষ্ঠার মধ্যে সেতু তৈরী করতে পারে। তাঁর গীতার ভাষ্যের নাম গূঢ়ার্থদিপীকা। সেখানে তিনি এই কথা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে অদ্বৈত জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ করাই গীতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাঁর মতে গীতার প্রথম থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত কর্ম নিষ্ঠার কথা আছে। সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত আছে ভক্তি নিষ্ঠার কথা। আর শেষ ছয় অধ্যায়ে আছে জ্ঞান-নিষ্ঠার কথা।

আচার্য্য মধুসূদন নিজে পরম জ্ঞাননিষ্ঠ হয়েও ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিমান ছিলেন। তাঁর মতে ভগবৎ ভক্তি জীবের কল্যাণ বিধান করতে পারে। অবশ্য তিনি কর্মমিশ্র, জ্ঞানমিশ্র এবং শুদ্ধভক্তির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছিলেন।

২. প্রাচীন ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা / ভাষ্য:

আচার্য্য রামানুজ-এর ভাষ্যে গীতার ভক্তিযোগের প্রাধান্য বেশী পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মতে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা জীব উদ্ধার পেতে পারে। আর নির্গুণ ব্রহ্মের যারা উপাসনা করেন, সিদ্ধিলাভের জন্য তাদেরকে অনেক কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করতে হয় - একথা পরমেশ্বর ভগবান নিজেই গীতায় উল্লেখ করেছেন। বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী রামানুজ আচার্য্য বলেন, ব্রহ্মকে স্বীকার বা গ্রহণ করলে জীব ও জগৎকে গ্রহণ করতে হয়। তা নাহলে বিচার-বিশ্লেষণে ত্রুটি থাকতে বাধ্য। তার মতে এই বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারাই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়।

শ্রীমাধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদের সমর্থক। তিনি বলেন, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অধীন হলেও ব্রহ্ম থেকে পৃথক। ব্রহ্মের সাথে জীব ও জগতের কখনো অভেদ সম্পর্ক থাকতে পারে না। গীতার ভাষ্যে তিনি বলেন, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হলে মানুষ ভক্তিলাভ করতে পারে। তাঁর মতে গীতায় ভগবান মূলত ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন / প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভক্তির মাধ্যমেই মানুষ সামীপ্য নামক মুক্তিলাভ করতে পারে।

পক্ষান্তরে নিম্বার্ক-আচার্য্য কর্তৃক গীতার ভাষ্য গীতার বাক্যার্থ বর্তমানে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে তিনি পারিজাত সৌরভ নামে শ্রীল ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন তার ভিত্তিতে গীতাবাক্যের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনেকটা অনুমান করা যায়। আচার্য্য নিম্বার্কের মতে গীতায় দ্বৈত-অদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্ত রয়েছে। কারণ গীতার ভাব অনুযায়ী জীব এবং ভগবান একদিকে ভিন্ন এবং অন্যদিকে অভিন্ন। জীব এবং জগৎ মিথ্যা বা মায়া নয়। ব্রহ্ম হলেন সগুণ, সবিশেষ, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান। তিনি অসীম কল্যাণকর, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। জীব ভগবান বা ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ - অর্থাৎ তাঁর জীবশক্তি। জগতের সাথেও তাঁর ভেদ এবং অভেদ সম্পর্ক আছে। মুক্ত অবস্থায়ও জীব ব্রহ্মে লীন হয়ে যান না। মুক্ত জীবের সাথেও ব্রহ্মের ভেদ সম্পর্ক আছে। ধ্যানস্থ অবস্থায় শুদ্ধ মনে ব্রহ্মের প্রকাশ হয়। মুক্তিলাভের জন্য ভগবৎ তত্ত্বের বিচার ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু ভক্তি, শরণাগতি এবং আত্মসমর্পণ ছাড়া মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে না - এই হলো গীতার সংক্ষিপ্ত সার বা সারমর্ম। এভাবে তিনি গীতার ভক্তিবাদের কথাই মূলত তুলে ধরেছেন।

অন্যদিকে শ্রীল বল্লভাচার্য বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি মূলত রুদ্র সম্প্রদায়ের শ্রীবিষ্ণুস্বামীর অনুগামী। বল্লভী সম্প্রদায়ের মতে জীব এবং জগৎ ব্রহ্মের অংশ। আবার ব্রহ্মের সাথে একের অভেদ সম্পর্কও রয়েছে। এই সম্প্রদায় ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তির কথা স্বীকার করেছেন। তবে অদ্বৈতবাদীদের নির্দেশিত মুক্তি এদের কাছে পছন্দনীয় নয়। তাঁদের মতে গীতার

প্রধান বক্তব্য হলো - যারা ভগবানের ভক্ত এবং তাঁর শরণাগত কেবলমাত্র তারাই ভগবানের কৃপায় মুক্তিলাভ করতে পারেন।

শ্রীধর স্বামীপাদ গীতার সুবোধিনী ভাষ্য রচনা করেছেন। এই ভাষ্যের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি ভারতবর্ষের সব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো তিঁনি ১৮ টি অধ্যায়ের সারমর্ম লিপিবদ্ধ করেছেন। এক একটি শ্লোকে এক একটি অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর ভাষ্যের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো তিনি গীতায় ভক্তিযোগের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন । তবে তাঁর আলোচনায় একটি সমন্বয়ের ছোঁয়াও পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তিঁনি কর্মযোগের প্রশংসা করেছেন। আবার ধ্যানযোগ ছাড়া যে কেবলমাত্র কর্মসন্ন্যাস দ্বারা মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে না - সেকথাও বলেছেন। তার মতে পরমেশ্বর ভগবানকে একমাত্র শুদ্ধ ভক্তি এবং শরণাগত হওয়ার মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। আর এই পরমেশ্বরের বিভূতি অনন্ত। ভক্ত এই বিভূতির কথা চিন্তা করে সর্বত্র ঈশ্বর-দৃষ্টি লাভ করেন। ভগবান কৃপাময়। কৃপাবসতই তিনি অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। সগুন উপাসনাও নির্গুণ উপাসনার মধ্যে ভক্ত সগুণ উপাসনারই আশ্রয় গ্রহণ করেন। তবে তাঁর মতে ভক্তির পাশাপাশি তত্ত্বজ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। এই তত্ত্বজ্ঞানই ভক্তকে সংসার থেকে উদ্ধার করতে পারে। আবার এইরূপ জ্ঞানের ফলে বৈরাগ্যের সৃষ্টি হয়। আর বৈরাগ্য ছাড়া জ্ঞানও ভক্তির উদয় হতে পারে না। দৈবী সম্পদই মানুষের মুক্তির কারণ। আবার আসুরী সম্পদ হলো মানুষের সংসার বন্ধনের কারণ। অন্যদিকে ভগবৎ ভক্তি এবং শ্রীভগবানের প্রতি শরণাগতির কারণেই মোক্ষলাভ হয়।

স্বয়ং শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বামীপাদের টীকার অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। আমরা শুধু একথা বলতে পারি টীকার নাম সুবোধিনী রাখায় এই নাম সার্থক হয়েছে। কারণ তাঁর টীকা অনুসরণ করে যে কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি / পাঠক সহজেই গীতার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন।

৩. মহাপ্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্মত গীতাভাষ্য:

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, দুর্ভাগ্যবসত গীতার যেসব প্রাচীন ভাষ্য ও টীকা রয়েছে তাদের প্রায় সবগুলো অভেদ-ব্রহ্মবাদীগণের দ্বারা রচিত। যেমন শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য এবং আনন্দগিরির টীকা মূলত অভেদ-ব্রহ্মপূর্ণ।

শ্রীধর স্বামীপাদের টীকা ব্রহ্মবাদপূর্ণ নয়। তবে তার মধ্যে সম্প্রদায়গত শুদ্ধ-দ্বৈতবাদের ছোঁয়াচ আছে। মধুসূদন সরস্বতীর ভাষ্য/টীকা অনেকটা ভক্তিসম্মত হলেও সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা কঠিন এবং তাদের জন্য খুব একটা কল্যাণপ্রদ নয়।

শ্রীরামানুজ আচার্য্যের ভাষ্য/টীকা মূলত ভক্তিসম্মত। কিন্তু আমাদের মত দেশে প্রচলিত শ্রীমন মহাপ্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের আলোকে গীতার ভাষ্যরূপে গ্রহণযোগ্য নয় - বলা যায়।

বাস্তবে গৌড়ীয় অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের আলোকে গীতার ভাষ্য হলেই একমাত্র বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি যারা আস্বাদন করতে চায় তাদের আনন্দ করতে পারে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু (১৪৮৬ - ১৫৩৩) এবং তার ছয়জন পার্ষদ (ষড় গোস্বামী) গীতার উপর কোন পৃথক ভাষ্য রচনা করেননি। তবে তাঁরা পূর্বের ভক্তিবাদী ভাষ্যকারগণের - বিশেষত রামানুজাচার্য্য, মাধবাচার্য্য এবং শ্রীধর স্বামীর ভাষ্যকে মর্যাদা দান করেন। এদের মধ্যে শ্রীল রূপগোস্বামী এবং শ্রীজীব গোস্বামীপাদ তাঁদের বিভিন্ন লেখায় গীতার বিভিন্ন শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

এরপর আসেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্য শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর (১৬২৬-১৭০৮) এবং শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ (১৭০০-১৭৯৩)। তাদের ভাষ্য হলো যথাক্রমে সারার্থদর্শিনী এবং গীতাভূষণ। তাঁরা বৈষ্ণব দর্শনের আলোকে গীতার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁরা উভয়েই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের অনুগামী এবং সমর্থক ছিলেন। কাজেই তাঁদের গীতা-ভাষ্যেও উপরোক্ত তত্ত্বের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। স্বয়ং মহাপ্রভু বলেন, জীব একদিকে ভগবান থেকে অভিন্ন। আবার অন্যদিক থেকে ভিন্ন। জীব অল্পচেতন বিশিষ্ট। আর ভগবান হলেন বিভু চৈতন্য। তাই চেতনার দিক থেকে বিচার করলে জীব এবং ভগবান অভিন্ন। কিন্তু সসীম জীব কখনো অসীম ও অনন্ত ভগবানের সমান হতে পারে না। তাই জীব এবং ভগবান ভিন্ন। জীব ও ভগবানের মধ্যে এই যুগপৎ ভেদ এবং অভেদ সম্পর্ক মানুষের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান। আর জীব স্বরূপত কৃষ্ণের নিত্যদাস। এই জগৎ মিথ্যা নয়। দেহাত্মবুদ্ধিই মায়া। আর সেই মায়ার প্রভাবে মানুষ কৃষ্ণকে ভুলে যায়। তাই মানুষ ত্রিতাপ দুঃখের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুযায়ী কেবলমাত্র ভক্তিযোগের মাধ্যমে শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করা সম্ভব। রাগানুগা প্রেমভক্তিই প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর - এই চারটি রসের মধ্যে যে কোন একটির মাধ্যমে ভগবানের ভজনা করা সম্ভব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে গীতায় অব্যাভিচারিণী ভক্তি এবং শরণাগতির মাহাত্ম্যই বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান বাসুদেবই একমাত্র উপাস্য। জীব ভগবানের এক অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশশক্তি।

আর যাকে আমরা মায়া বলি তাহলো ত্রিগুণ সমৃদ্ধ (সত্য, রজ এবং তম গুণ) প্রকৃতি। যারা শ্রীভগবানের শরণাগত হতে পারে, কেবলমাত্র তারাই মায়ার সাগর থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে। গীতায় ভগবান যথার্থই বলেছেন -

দৈবী হেষ্যা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তিতে।।

(গীতা ৭/১৪)

আবার শ্রীভগবানকে সবসময় স্মরণ বন্দনা এবং অর্চনা করলেও তাঁকে পাওয়া সম্ভব। গীতায় ভগবান নিজেই বলেছেন -

মন্মনা ভব. মদ্ভক্ত মদ্ যাজী মাং নমস্কুরু।

(গীতা ৯/৩৪)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (১৮৩৮ - ১৯১৪) ভগবদ্ গীতার উপর চারটি বই/ভাষ্য বাংলা ভাষায় রচনা করেন। বিষয়টি ১৮৯৬ সালে প্রথম আরম্ভ হয়। এই সময় তিনি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকে অনুসরণ করে গীতার উপর তাঁর প্রথম ভাষ্য লেখেন যা রসিকরঞ্জন ভাষ্য হিসেবে পরিচিত হয়। এর পাঁচ বছর পর তিনি শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের গীতা-ভাষ্যকে ভিত্তি করে আরোও একটি ভাষ্য তৈরী করেন যা বিদ্বৎরঞ্জন নামে পরিচিত। আবার ১৮৯৬ সালে তিনি মাধবাচার্য্যের ভাষ্য প্রকাশ করেন। একই সময়ে তাঁর পূর্বের লেখা ভগবদ্গীতা দশমূল নামক একটি ছোট বই প্রকাশ করেন। একে গীতার দশটি প্রয়োজনীয় নীতি (Ten Principles of the Gita) বলা হয়।

অন্যদিকে ১৯১৪ সালে তাঁর ছেলে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর (১৮৭৪ - ১৯৩৭) গীতার উপর শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সংস্কৃত ভাষ্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। তিনি ষড়গোস্বামীদের মতই গীতার উপর কোন একক ও পৃথক ভাষ্য লেখেননি। তবে গোস্বামীগণের মতো তিনিও তাঁর বিভিন্ন লেখায় গীতার বিভিন্ন শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে তার ব্যাখ্যা করেন।

৪. আধুনিক যুগের কর্মী ও জ্ঞানীদের গীতা-ভাষ্য

আধুনিক যুগে যেসব ভারতীয় দার্শনিক ও মনীষী তাঁদের নিজ নিজ চিন্তা-চেতনা বা দর্শন অনুযায়ী গীতার ব্যাখ্যা করেছেন তাদের মধ্যে ঋষি অরবিন্দ, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গান্ধী এবং আচার্য্য বিনোবা ভাবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবার আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আলোকে ড: গিরীন্দ্রশেখর বসু গীতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে এদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বুঝতে পারেন যে গীতার প্রাচীন ভাষ্যসমূহ যতই পান্ডিত্যপূর্ণ হোক না কেন, সেগুলো আধুনিক ম-মানসিকতার সব ধরণের সন্দেহ / সংশয় নিরসন করতে পারেনি। তাঁর মতে ধর্ম এবং পরিপূর্ণ মানুষ অভিন্ন। তবে ভক্তি ছাড়া মনুষত্ব নেই। আমাদের হৃদয়ের আবেগ যখন ঈশ্বরমুখী হয় তখন তার নাম হয় ভক্তি। আর আমাদের সংকল্প (will) যখন ভগবদ্ মুখী হয়, তখন তার নাম কর্ম। তার মতে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিষ্কামকর্ম, আত্মজ্ঞান এবং ভক্তির আদর্শের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ভক্ত হলেও আসলে ছিলেন যুক্তিবাদী। তাই তিনি ভগবানের উক্তিরও সমালোচনা করেছেন।

"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পর ধর্মো ভয়াবহ" - ভগবানের এই কথার মধ্যে গভীর সত্য নিহিত আছে - ঐতিহাসিক উদাহরণের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র তা প্রমান করেছেন। তবে দুঃখের বিষয় হলো এই যে তিনি গীতার বিশ্বরূপদর্শণ যোগ অধ্যায়ের পর ভগবানের পক্ষে আর কোন কথা বলার প্রয়োজন মনে করেননি। এটি ভগবদ্ চরণে মারাত্মক অপরাধ বলা যায়। তাঁর মৃত্যুর অনেক পর যোগীরাজ নিগমানন্দ সরস্বতী প্লানচেটের মাধ্যমে তাঁর আত্মাকে আহ্বান করে জানতে পারেন যে তিনি স্বর্গে থাকলেও সেখানে অতি কষ্টে রয়েছেন। কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন যে গীতার ব্যাখ্যায় ভুলত্রুটি করায় তাঁর এই গতি হয়েছে। কি করে তাঁর কষ্ট দূর হতে পারে - একথা তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, তাঁর সম্পর্কে কটু কথা, নিন্দা ইত্যাদি করতে হবে। নিগমানন্দ সরস্বতী এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার পর আবার প্লানচেট - এর মাধ্যমে তাঁর আত্মাকে আহ্বান করে তার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে এখন তিনি স্বর্গে ভাল আছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অতি ন্যায়পরায়ণ এবং যুক্তিবাদী লোকও গীতার পরিধি সীমিতকরণে অগ্রসর হলে তার পরিণতি উপরোক্ত হতে বাধ্য।

পক্ষান্তরে কবি নবীনচন্দ্র সেন-এর কুরুক্ষেত্র কাব্যে গীতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি ভগবদ্গীতার সুন্দর পদ্যানুবাদ করেছেন।

অন্যদিকে ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বলেন, গীতার মূল শিক্ষা রয়েছে পুরুষোত্তম যোগ - অধ্যায়ে। তিনি যুক্তি দেন পুরুষোত্তমের সাথে একাত্মতা অনুভব করলে মানুষের জীবন ও চেতনা দিব্য জীবন ও দিব্য চেতনায় রূপান্তরিত হয়। ফলের কামনা না করে নিষ্কাম কর্ম মানুষকে পরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। অরবিন্দের মতো ব্রিটিশ আমলের বিপ্লবীরাও একসময় ভগবদ্গীতা থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। শ্রী ভগবানের বাণী "মামনুস্মর যুধ্য চ" - তাদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে দুর্জয় ও দুঃসাহসী করে তুলেছিল। বিপ্লবী মহারাজ শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর গীতা স্বরাজ - এই বিষয়ে আলোকপাত করে।

গীতার আধুনিক ভাষ্যকারদের মধ্যে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তাঁর গীতাব্যাখ্যাণে (শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতারহস্য কর্মযোগ শাস্ত্রে) তার পরিচয় আছে। তাঁর মতে গীতায় কর্মযোগের পরিচয় আছে। তিনি বলেন, গীতায় কর্মযোগের প্রাধান্য স্থাপিত হলেও সেই কর্ম জ্ঞান-ভক্তি বিবর্জিত নয়। প্রবৃত্তিমূলক ভাগবত ধর্মই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। এই দিক থেকে তাকে আমরা গীতার বিভিন্ন শিক্ষার সমন্বয় কারকও বলতে পারি।

শ্রীগীতার ভাষ্যকারদের মধ্যে কেউ কেউ কর্মকে, কেউ জ্ঞানকে, আবার অন্যেরা ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ কর্ম-সন্ন্যাসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ভগবদ্গীতায় এই সব কিছুর সমন্বয় রয়েছে বলা যায়। কিন্তু এই সমন্বয় সাধনের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? এই বিষয়ে তিলক তাঁর গীতারহস্য গ্রন্থে তার আভাস দিয়েছেন। তার মতে কর্মই গীতার কেন্দ্র-বিন্দু ও মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবান অর্জুনকে একান্তভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যে জ্ঞান এবং ভক্তি নিষ্কাম কর্মের বিরোধী নয়। বরং নিষ্কাম কর্মের পরিপোষক এবং সহায়। জ্ঞান ও ভক্তি কর্মে গিয়ে পরিসমাপ্ত হয় এবং পরিণতি লাভ করে। এই ভাবে তিলক ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের সমন্বয় করেছেন। তবে কর্মই যে গীতার প্রধান কথা তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই শ্রীকৃষ্ণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তার মতে কর্ম করিবে - শুধু একথা বললে সমন্বয় সঠিকভাবে হতো না। ভগবান বলেছেন, স্বধর্মর দ্বারা অনুমোদিত কর্ম অবশ্যই করা উচিত। ভগবানের কাছে কর্মের ফলাফল অর্পণ করে নিষ্কামভাবে যে কর্ম করা হয়, সেই কর্মই উত্তম। এরূপ কথা বলায় জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্মের সমন্বয় গীতায় সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি নিজের জীবনেও গীতায় উল্লেখিত কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তিযোগের শিক্ষার যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করেছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীও গীতার উপর নিজের চিন্তা-চেতনা এবং দর্শনের ভিত্তিতে বই লিখেছেন। তাঁর মতে গীতার প্রধান শিক্ষা হলো অনাসক্তি যোগ। গীতায় মানুষকে স্থিত-প্রজ্ঞ হওয়ার উপদেশ দেয়া

হয়েছে। এজন্য যিনি অহিংস এবং সত্যাশ্রয়ী বা সত্যাগ্রহী, একমাত্র তিনিই অনাসক্ত হতে পারেন। তাঁর মতে গীতার অর্জুন ঐতিহাসিক অর্জুন নন। গীতার যুদ্ধ ঐতিহাসিক যুদ্ধ নয়। গীতার কুরুক্ষেত্র আমাদের হৃদয়ক্ষেত্র । এখানে দৈবী এবং আসুরী মনোভাব রণক্ষেত্রে সমবেত হয়েছে। গান্ধীজী বলেন: "যিনি মানুষের উপরে উঠিয়া পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত হইয়াছেন, যিনি শুভাশুভ পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি সর্বভূতে লীন হইয়াছেন, তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের নায়ক হইতে পারেন না, ইহা নিশ্চিত।" কিন্তু তাঁর এই উক্তির সাথে কোন কৃষ্ণ ভক্তই একমত হতে পারেন না। একসময় ভারতে ক্ষত্রিয় ধর্মের যে আদর্শ ছিল, ভারতের রাজর্ষিগণ যে আদর্শের অনুসরণ করতেন, সেই আদর্শ হলো - লোক সংগ্রহের জন্যে, ধর্ম সংস্থাপনের জন্যে ক্ষত্রিয়কে অনাসক্ত হয়ে, স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে - তাহলেই পাপ-পুন্য তাকে স্পর্শ করতে পারবে না কারণ গীতায় আছে -

"ব্রহ্মণাধ্যায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা করোতি।

লিপ্যতেন স পাপেন পদ্মপত্রমিব্যম্ভস্য।।"

(গীতা ৫/১০)

আচার্য বিনোবা ভাবে তাঁর গীতাপ্রবচন গ্রন্থে ১৮টি অধ্যায়ে গীতার মূলবাণী উদঘাটন করেছেন। অত্যন্ত সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তিনি গীতার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। গীতার মূল বক্তব্য সম্পর্কে তিনি মূলতঃ মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী। তবে কোন কোন স্থানে গীতার ব্যাখ্যায় তিনি কিছুটা স্বাতন্ত্রের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন বলা যায়, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৭ নং শ্লোকে কর্ম, অ-কর্ম ও বিকর্মের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন ভাষ্যকারদের মতে কর্ম বলতে শাস্ত্রসম্মত কর্ম, বিকর্ম বলতে নিষিদ্ধ কর্ম, আর অকর্ম অর্থে কর্মের অভাব বোঝায়। কিন্তু তাঁর মতে বিকর্ম বলতে বিশিষ্ট কর্ম বোঝায়। - অর্থাৎ যে কর্মের সাথে মনের মিলন হয়। আর কর্ম হলো, স্বধর্ম আচরণের বাহ্য দিক - স্থুলক্রিয়া। তাঁর মতে কর্মে বিকর্ম জুড়ে দিলেই বি-কর্ম হয়। এক্ষেত্রে কর্ম যে করেছি তা মনেই হবে না।

গীতার ব্যাখ্যা মনোবিদদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ড: গিরীন্দ্রশেখর নামে একজন মনোবিদ গীতার বেশ কিছু শ্লোকের উপর কিছুটা নতুনভাবে আলোকপাত করেন। মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের আদি গুরু ফ্রয়েড বলেছেন - ইন্দ্রিয় নিরোধ কল্যাণের পথ নয়। যথার্থ কল্যাণ লাভ করতে হলে জৈব প্রবৃত্তিকে উর্দ্ধমুখী করতে হবে। গিরীন্দ্রশেখর বলেন, এই কথার সমর্থণ গীতায়ও আছে। কারণস্বরূপ তার মতে শ্রীকৃষ্ণ মানুষের প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করেন নাই।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ নয়, বরং সংযমের পথই শ্রেয় - একথা কৃষ্ণ গীতায় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছেন। তার মতে গীতায় যে তিন ধরণের আহারের (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক) কথা বলা হয়েছে এবং এসব আহার মানুষের মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে - এসব নিয়ে গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণের অবকাশ আছে।

ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি এবং বিখ্যাত দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানও গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা মূলত পাশ্চাত্যের পাঠকদের উদ্দেশ্যে রচিত বলা যায়। তিনি গীতার যে ইংরেজী ব্যাখ্যা দেন সেটি মূলানুগত এবং শব্দসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে বলা যায় মাত্র।

ইসকনের গীতা কেন যথাযথ বলা হয় ?

গীতার বক্তা হলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আর শ্রোতা হলেন অর্জুন। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান হিসাবে মেনে তাঁর পরামর্শ, উপদেশ, আদেশ, নির্দেশ যথাযথভাবে একসময় পালন করেছিলেন। ইসকন - প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্ত্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান হিসেবে গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ মূলত কি চেয়েছেন, তার ভিত্তিতে গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে কৃষ্ণের মূল দর্শনকে ভিত্তি করেই গীতার ব্যাখ্যা করা বা হওয়া উচিত। অথচ গীতার প্রায় সব অনুবাদক এবং ব্যাখ্যাকারী নিজ নিজ চিন্তা-চেতনা, আবেগ, দর্শণ, বিশ্বাস, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদির আলোকে গীতার বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা / ভাষ্য প্রদান করেছেন যা সঠিক নয়।

শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যা ভারতীয় ভক্তিযোগ দর্শণের আলোকে হওয়ায় তাকে গীতার যথাযথ ব্যাখ্যা হিসেবে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায়। এই কারণেই তাঁর অনুবাদকৃত গীতার ইংরেজী সংস্করণ বিশ্বের সর্বত্র প্রায় সব ভাষায় অনুদিত হয়ে ইতিমধ্যেই প্রচারিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

প্রভুপাদ কর্তৃক লিখিত গীতার ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য্য গীতাকে পূর্বের মতো আর বুদ্ধিজীবিদের স্তরে না রেখে সাধারণ মানুষের স্তরে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। তাঁর কর্তৃক লিখিত গীতার পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি সংস্করণ গীতার অপরাপর ইংরেজি সংস্করণের / অনুবাদকের চেয়ে অনেক বিস্তৃত, সহজ এবং সরল ভাষায় হওয়ায় সেটি পাশ্চাত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তিনি মূলত শ্রীধর স্বামী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখের ভাষ্য অতি সহজ এবং সরল ভাষায় এমন ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হন যাতে সাধারণ পাঠক এবং ভগবৎ ভক্ত সহজেই গীতার বিভিন্ন শিক্ষা বুঝতে সক্ষম হয়।

প্রভুপাদের মূল কৃতিত্ব হলো তিনি গীতাকে কঠিন ও দুর্বোধ্য ভাষা থেকে সহজ ও সরল ভাষায় প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো গীতার মূল-কেন্দ্রিক শিক্ষা - অর্থাৎ ভক্তিবাদকে সব কিছুর উর্দ্ধে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। কৃষ্ণভাবনামৃতই গীতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় - এই শিক্ষা তিনি গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভিন্ন শ্লোকের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য্য তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

শ্রী ভগবানের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ - সেটি কর্মের মাধ্যমে হোক, বা জ্ঞানের মাধ্যমে হোক, অথবা ভক্তির মাধ্যমে হোক - এই হলো গীতার আসল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই ব্যাখ্যাই তাঁর ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

গীতাকে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ইত্যাদি অঙ্গন থেকে তিনি বের করে একে গণমানুষের স্তরে আনতে সক্ষম হয়েছেন বলা যায়। এসব কারণেই তিনি তার অনুদিত গীতার নাম রাখেন “শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা যথাযথ”। এই নামকরণ এখন নিঃসন্দেহে যথার্থ বলা যায়।